প্রেক্ষিতঃ হাসিনার ভারত সফর

সরকারের তাবেদারীর নমূনা

১.০ সূচনাঃ

গত ১০ই জানুয়ারী ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত গমন করেন। এই সফরের পূর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের মিডিয়াতে একে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, ফলপ্রসু এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হবে বলে নানা ধরণের আলোচনা ও বিশ্লেষণ ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। যদিও বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি এই প্রত্যাশাকে সংযত রাখার জন্য বলেছিলেন- 'এটা কোন কুটনৈতিক নয় বরং রাজনৈতিক সফর। তাই বেশী কিছু প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না।' শেখ হাসনার ভারত সফরের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিস্ট কি কি বিষয়ে আলোচনা করা হবে, কোন কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। বরং শেখ হাসিনা গত সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় যেভাবে বলেছিলেন যে, 'আমি জানি কিভাবে deal করতে হয়, আমার উপর আস্থা রাখুন'। ঠিক সেই ভঙ্গীতেই সহাস্য শেখ হাসিনা কোন সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা জনগণকে না জানিয়ে ভারত সফর করেন। এমন কি গত ৬ই জানুয়ারী ২০১০ সালে জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া রাষ্ট্রীয় ভাষণে আসন্ন ভারত সফরে টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তার পানি বন্টন, ফারাক্কা সমস্যা, এশিয়ান হাইওয়ে, সীমান্তে নিরীহ মুসলিম হত্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় অপতৎপরতা, ভারতীয় হাইকমিশনে ভারতীয় কমান্ডো ব্যাহিনীর উপস্থিতি সহ অসংখ্য বিষয়ে তার আশু ভারত সফরে কি কি করা হবে এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি।

তবে ০৭/০১/২০১০ইং তারিখের হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকা শেখ হাসিনার ভারত সফরে ৬টি চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া শেখ হাসিনার ভারত সফরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ভারতের পররাষ্ট্র সচীব নিরুপমা রাও বলেন, 'ভারত তার নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হবার জন্য বাংলাদেশকে বড় ধরণের সহায়তা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ... হাসিনার এই সফর ভারত-বাংলাদেশকে নতুন ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক গড়ার এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দেবে।' তিনি তার বক্তব্যে বাংলাদেশের সাথে ৫টি চুক্তির কথা বলেছেন যাতে বোঝা যাচ্ছে ভারত সবকিছু প্রস্তুত করে হাসিনাকে সই করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে।

৪ দিনের এই সফরে ভারতের সাথে তিনটি চুক্তি ও দুটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষর এবং ৫০দফা মনমোহন-হাসিনা যৌথ ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুক্তি ও সমঝোতার বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ ভারত চট্রগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের আশুগঞ্জকে পোর্ট অব কল হিসেবে ঘোষণা করে ভারতকে ট্রানজিট প্রদান।

তৃতীয়তঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন সংক্রান্ত যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি।

দেশে ফিরে আসার পর তার দল ও সরকারের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা প্রদর্শনের জন্য 'এয়ারপোর্ট টু যমুনা নাটক' মঞ্চস্থ করা হয়। কিছু কিছু ব্যানারে শিরোনামও দেয়া হয়, "বাঙ্গালীদের শেখ হাসিনার কাছে চির ঋণী থাকা উচিত"। শেখ হাসিনা নিজেও গত ১৬ই জানুয়ারী এক সংবাদ সম্মেলনে তার এই সফরকে ১০০ ভাগ সফল বলে দাবী করে একে দুদেশের মাঝে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী মাইলফলক হিসেবে আখ্যা দেন।

অথচ বাংলাদেশের জনগণ ও সেই সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের হতবাক হওয়ার মত বিষয় হলো গত তিন-চার যুগ ধরে চাপাচাপি করেও ভারত যেসব বিষয়ের একটিতেও এমনকি আংশিকভাবেও বাংলাদেশকে রাজী করাতে পারেনি, তার প্রায় সবগুলোই ভারত রাতারাতি আদায় করে নিয়েছে। আর শেখ হাসিনাও অতি দ্রুততার সাথে ভারতকে সব কিছু উজাড় করে দিতে পারার শতভাগ সাফল্যের আনন্দে এতটাই বেসামাল হয়ে পড়েছেন যে তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের খলচরিত্র দুর্যোধনের সাথে নিজেকে তুলনা করে বসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, "দুর্যোধনকে মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন, কী চাই তোমার?" উত্তরে দুর্যোধন বলেন, "সুখ চাহি নাই মহারাজ জয় চেয়েছিনু, জয় পেয়েছি। দুর্যোধনের মত আমিও মনে করি জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই জয় নিশ্চয়ই ভারতের বিরুদ্ধে নয়, তাহলে এ জয় কার বিরুদ্ধে? বাস্তবতা হলো, এই জয় বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে। এই অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার আকাংখার বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি ইসলামী চিন্তা চেতনা ও পরিচয়ের বিরুদ্ধে। আর তাই আজ দেশের জনগণের প্রশ্ন, "বাঙ্গালীদের শেখ হাসিনার কাছে চির ঋণী থাকা উচিৎ" নাকি, "বাংলাদেশকে ভারতের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য" এই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা উচিৎ।

অধিকন্তু ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা পূর্ববর্তী সকল সরকারের ধারাবাহিকতায় কাফের-মুশরিক প্রভূদের স্বার্থরক্ষায় যেসব চুক্তি করেছেন, সন্ত্রাস দমনের নামে যেভাবে ইসলামের

বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং বর্তমান বিশ্বে মুসলিম নিধনকারী আমেরিকা-ব্রিটেন-ভারতের দক্ষিন এশিয়া নিয়ে ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনা; এসবের আলোকে মনমোহন-হাসিনা চুক্তিগুলোকে আলোচনা করতে হবে। আর তাই এই নিবন্ধটি চারটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা সাজানো হয়েছে।

১. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই সফরের মূল্যায়ন।

২. মনমোহন-হাসিনা যৌথ ইশতেহার ও স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের ভয়াবহতা।

৩. একশত ভাগ সফল এমন দাবীর যথার্থতা।

৪. খিলাফত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির নমূনা ।

২.০ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনার সফর ঃ

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় শেখ হাসিনার ভারত সফরকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে এই অঞ্চলকে ঘিরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক কাফের-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পরিকল্পনার আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে দক্ষিন এশিয়া বিশ্ব শক্তিসমূহের কাছে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেঃ

- বাংলাদেশ ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার, ‘the central front in our enduring struggle’ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটনের ‘the central focus in our foreign policy’ এমন বক্তব্য থেকে মার্কিনীদের কাছে দক্ষিন এশিয়ার গুরুত্ব সুস্পষ্ট।
- প্রেসিডেন্ট ওবামা তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, *"We will not apologise for our way of life, nor will we waver in its defence, and for those who seek to advance their aims by inducing terror ... we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you."* ওবামার বক্তব্য স্পষ্ট- ‘ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অনন্ত ক্রসেড চলবেই’। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিন এশিয়ার মুসলিম দেশ আফগানিস্থানের পর পাকিস্তানকে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের এক নতুন ফ্রন্ট হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত মরিয়ার্টির- ‘*denial of space to terrorism*’ ঘোষণা বাংলাদেশের জন্য কোন শুভ ইঙ্গিত বহন করে না।
- এই অঞ্চলে উদীয়মান চীনের দিকে আমেরিকার দৃষ্টি রয়েছে যা তাদের বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট- “The US strategy for the region is built around containing a future threat from China".
- উপরোক্ত দুটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বারাক ওবামা India Abroad ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সংখ্যায় ভারতের সাথে "a close strategic partnership" এর কথা উল্লেখ করেন।
- ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার "close strategic partnership" নীতি অনুসরণের পাশাপাশি দক্ষিন এশিয়ার নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে তার নিজস্ব কিছু পৃথক পরিকল্পনা রয়েছে। যে ব্যাপারে বিশ্বের আরেক কাফের-সাম্রাজ্যবাদী মোড়ল বৃটেনের কাছ থেকে সর্বদা উৎসাহ ও সহযোগীতা পেয়ে আসছে।
- চীন তার নিজের স্বার্থ ও মার্কিনীদের ‘contain China’ নীতির কারণে মালাক্কা প্রণালী, মায়ানমার, বঙ্গোপসাগরসহ দক্ষিন এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে তৎপর।

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের কাছে কৌশলগত প্রতিযোগীতার ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়েছে। একই সাথে এই অঞ্চলে ইসলামের উত্থান ঠেকাতে বাংলাদেশকে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখতে চায়।

এমনই এক ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১/১১-এর সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পর মার্কিন ও বৃটেন-ভারত সমঝোতার চুড়ান্ত ফসল শেখ হাসিনার সরকার। আর তাই ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার সরকার পিলখানা হত্যাকান্ডে ভারতকে সহযোগীতা প্রদান, ট্রানজিট, টিফা, গভীর সমুদ্র বন্দর, মার্কিনীদের সাথে যৌথ সামরিক মহড়া, ‘আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস’ দমনে আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠন সহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশ্য দালালী করছে। তাই মনমোহন-হাসিনা চুক্তিতে বাংলাদেশ কী পাবে তা কখনোই মূখ্য বিষয় নয়; বরং ভারত কী এবং কিভাবে পাবে অথবা ভারত যা যা চায় শেখ হাসিনা তা কিভাবে দিবেন- সেটাই এই সফরের মূল আলোচ্য বিষয়।

৩.০ ভারত বাংলাদেশের বন্ধু !

ভারত কখনোই আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র হতে পারে না। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়- কোন না কোন সীমান্তে বিএসএফ কাউকে ধরে নিয়ে গেছে, কাউকে গুলি করে হত্যা করেছে অথবা কোন সীমান্তবর্তী গ্রামে ঢুকে তান্ডব চালিয়েছে। পরিসংখ্যানুযায়ী গত ২০০৯ সালে বন্ধুপ্রতিম হাসিনা সরকারের শাসনামলে ভারতের বন্ধুত্বের উপহার ১২৩ জন বাংলাদেশী মুসলিম হত্যা। গত ১০ বছরে এ সংখ্যা ১০০০ ছাড়িয়ে গেছে, আহত ও পঙ্গু করা হয়েছে ৮৪৬ জন এবং অপহৃত ও ধর্ষিত হয়েছে ৮৯৫ জন।

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত সবসময় আধিপত্যবাদী নীতি অবলম্বন করে এসেছে। আমরা শুনেছি গুজরাল ডকট্রিনের কথাও - ভারত তার স্বার্থের প্রতি আঘাত সৃষ্টিকারী যেকোনো দেশের ওপর আক্রমণ চালানোর অধিকারও রাখে।

ভারত বাংলাদেশকে কব্জা করতে চায়-

- বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এমন যে বাংলাদেশের কারণে ভারতের সাতটি রাজ্য তার মূল ভুখন্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। আর এই রাজ্যগুলোকে ভারত গায়ের জোরে শাসন করছে। এই রাজ্যগুলোতে ভারতীয় দখলদায়িত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম বাঁধা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব। তাই ভারত বাংলাদেশকে অস্তিত্বহীন করতে সদা তৎপর। বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতে মাথা ব্যাথার আরেকটি কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ যদি ভারতের কব্জায় না থাকে তাহলে এখানে মার্কিনীদের এবং সেই সাথে ভারতের অন্যতম শত্রু চীন ও পাকিস্তানের ঘাঁটি গাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।
- দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে ঐতিহাসিক। ভারতের ব্রাক্ষণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী সব সময় সমস্ত দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার উপর ব্রাক্ষণ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় ব্রাক্ষণ্যবাদ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের স্বপ্ন হিমালয়ের দক্ষিনে সমস্ত অঞ্চলে একক হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করা। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পরক্ষণেই কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপানলি বলেছিলেন : Neither the Congress nor the nation has given up its claim of United India' - কংগ্রেস কিংবা জাতি অখন্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করেনি। ভারতের তৎকালীন প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন : 'Sooner than later, we shall again be united in common allegiance to our nation.' অর্থাৎ অতি সত্বর আমরা জাতি হিসেবে আবার একীভূত হব। তাই এতদ্বঞ্চলে যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের তারা বিরোধী। সে প্রতিবেশী দেশগুলোকে তার অধীনস্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করছে আর এ লক্ষ্যে সে সবসময় তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নানা ধরণের অপতৎপরতার জন্ম দিয়ে আসছে। ভারত বাংলাদেশসহ তার প্রতিবেশী দেশগুলো যেমনঃ ভূটান, নেপাল ও শ্রীলংকার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে সদা তৎপর। ইতিমধ্যেই সে সিকিম ও ভূটানকে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে নিয়েছে।
- ভারতের শাসকগোষ্ঠীর কাছে নেপাল, ভূটান বা শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের মূল পার্থক্য হলো এটি একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। এ জনপদের মানুষ ব্রাক্ষণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামকে তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের উপায় ও পরকালের মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভারতের ব্রাক্ষণ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে জাতিভেদ প্রথার সর্বনিম্নে অবস্থিত নমশুদ্রদের ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট এক ভূখন্ডের নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের টিকে থাকা ও সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্রাক্ষণ্যবাদের কর্তৃতের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া।

এই জন্যে এই ধরণের একটি রাষ্ট্র ও তার জনগণকে ভারতের শাসক গোষ্ঠী সবসময়ই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং সে অনুযায়ী তাদের রাজনীতি, সামরিকনীতি, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করেছে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর সারকথা হচ্ছে, বাংলাদেশ ভারতের শত্রু রাষ্ট্র। ভারত অতীতে কখনোই আমাদের বন্ধু ছিলনা এবং ভবিষ্যতেও কখনোই আমাদের বন্ধু হবে না।

৪.০ মনমোহন-হাসিনা যৌথ ইশতেহার ও স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের ভয়াবহতা ঃ

৪.০১ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধ্বংস ও পূর্ণাঙ্গ দাসত্বের অঙ্গীকার নামা ঃ

ভারত বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণার ৫০ দফায় দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর সামগ্রিক সহযোগিতা, অবকাঠামোর ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনা মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের চাহিদার তালিকার কাছে আত্মসমর্পন করেছে যাকে আসলে পূর্ণাঙ্গ দাসত্বের অঙ্গীকারনামা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ এই সকল চুক্তি, অঙ্গিকার , সমঝোতা, সহয়োগিতার প্রতিশ্রুতি কেবল আমাদের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করবে না সর্বোপরি আমাদেরকে দূর্বল, নতজানু, মেরুদন্ডহীন, অনুগত দাস রাষ্ট্রে পরিণত করবে যা বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাখে।

যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে, ভারত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ লাভ করবে। শেখ হাসিনা ও ভারতীয় চররা এই বিষয়টিকে যতই একটি অর্থনৈতিক ইস্যু হিসেবে চালানোর অপচেষ্টা করুক না কেন মূলত এটি একটি ভূ-রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু।

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের মূল প্রবেশপথ। সেই সাথে এটি দক্ষিন এশিয়ার পেটের ভেতর অবস্থিত। এই বন্দর থেকে ভারত, চীন, বার্মা, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি দেশের দূরত্ব কয়েকশত কিলোমিটার মাত্র। যে কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের উপর আগ্রহ রয়েছে আমেরিকা, চীন ও ভারত সহ আরো অনেক পরাশক্তির। দীর্ঘদিন ধরেই এই বন্দরের নিয়ন্ত্রন লাভের জন্য আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর মধ্যে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় ধরণের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। ভারত কর্তৃক এই বন্দর ব্যবহৃত হলে স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নাখোশ হবে এবং নানামুখী ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, পোল্যান্ডের বন্দর ব্যবহার নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সূচনা হয়েছিল। নিকট অতীতে সুয়েজ, শাতিল আরব ইত্যাদি জলস্থাপনা নিয়ে যুদ্ধ বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আবার ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভূ-রাজনেতিক আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে হংকং থেকে সুদান পর্যন্ত বন্দর স্থাপন ও নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার নীতি অবলম্বন করেছে চীন। যা 'স্ট্রিং অব পার্লস' (String of Pearls) নীতি হিসেবে পরিচিত। কিংবা যদি আরো নিকটে শ্রীলংকায় ভারতের মদদপুষ্ট তামিল টাইগারদের সাথে পক প্রনালীর কর্তৃত্ব নিয়ে যে যুদ্ধ তা ভুলে গেলে চলবেনা। এ সকল ঘটনাই সাক্ষ্য দেয় ভূ-রাজনীতিতে বন্দর, প্রণালী, খাল কিংবা আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভারতের ভূমিকা থেকেও আমরা দেখি যখন ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবর রহমান ভারতের কলকাতা বন্দর মাত্র ৬ মাসের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিরাপত্তার অজুহাতে ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে। একই সময়ে ভারতের ভেতর দিয়ে নেপালের ট্রানজিট মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে নিরাপত্তা ইস্যুতে বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার। ভারত তার নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোকে উন্মুক্ত কারাগারে পরিণত করেছে। ভারত দিনের বেলা ১২ ঘন্টার জন্য করিডোর খোলা রাখে আবার রাতে বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশ যদি তিনবিঘা করিডোরের জন্য ভারতের প্রতি হুমকি হয় তবে ভারতকে সমূদ্রবন্দর, নৌ-রেল-রোড-এয়ার ট্রানজিট দেয়ার পর আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করাই বাহুল্য।

বন্দর ও অভ্যন্তরীণ রুটসমুহ ভারতকে ব্যবহার করতে দেয়ার বিষয়টিকে কোন বাড়ীর মালিক কর্তৃক তার বাড়ীর নীচ তলায় বাজার বসানোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক হয়তো সাময়িকভাবে আর্থিকভাবে লাভবান হবেন কিন্তু এতে বাড়ীর বাসিন্দাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে এবং তাদেরকে দূষণ, নিরাপত্তাহীনতা ও সম্মানহানির মতো বিষয়গুলোকে সদা সর্বদা মোকাবেলা করতে হবে। (অবশ্য শেখ হাসিনা স্পষ্ট বলেছেন তিনি সুখ চান না, জয় চান)।

পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে দুই প্রধানমন্ত্রী তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইস্যুতে একমত হয়েছেন। প্রশ্ন হলো কার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা? চুক্তির ধারাবাহিকতায় যেসকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও কৌশলগত সুযোগ ভারতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তাতে কেবল বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিতই হবেনা বরং নিরাপত্তা বলতে আর কিছুই থাকবেনা। এসবের পরেও হাসিনা ও তার সরকার বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে ভারতের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাইতো, শেখ হাসিনা ভারত সফরের পূর্বে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন কোন জুজুর ভয় দেখিয়ে ট্রানজিট দেয়া থেকে বিরত রাখা যাবেনা। উপরন্তু উলফার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অন্যতম মাথাব্যাথা ৭টি অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকে দমনে ভারতকে সহায়তা করেছেন।

সর্বোপরি, হাসিনা সরকার দেশের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় তার জ্বাজল্যমান প্রমাণ হচ্ছে পিলখানা ট্র্যাজেডি। যার মাধ্যমে ভারত হাসিনা সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে একটি দুর্বল ও ভঙ্গুর বাহিনীতে পরিণত করতে চেয়েছে এবং বিডিআরকে ধবংস করে দিয়েছে।

৪.০২ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমন চুক্তিঃ

শেখ হাসিনা ভারতের সাথে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন চুক্তি করেছেন। যার মাধ্যমে আমাদের সৈন্য, গোয়েন্দা সংস্থা, গোয়েন্দা তথ্য ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক সুবিধাবলী আন্তর্জাতিকভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। এই চুক্তি হচ্ছে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে ক্রুসেডার রাষ্ট্র আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্ররা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলাম তথা

মুসলিম উম্মাহ্’র উপর যে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছে তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। যার প্রথম ধাপ হলো ক্রুসেডার আমেরিকা কর্তৃক সরাসরি মুসলিম ভূখন্ড দখল। যার নমুনা আমরা দেখছি ইরাক, আফগানিস্তানে। দ্বিতীয় ধাপটি হলো বিশ্বের মানচিত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার স্থানীয় কৌশলগত মিত্রদের দিয়ে মুসলিম ভূখন্ডগুলোকে দখল এবং মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালানো। এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের নিয়ন্ত্রন ও নির্যাতন করছে ইসরাইলকে দিয়ে, আফ্রিকার সোমালিয়ায় ইথিওপিয়ান সেনাবাহিনী দিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়াকে দিয়ে এবং দক্ষিন এশিয়ায় ভারতকে দিয়ে। এত কিছুর পরও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে পশ্চিমা কাফের শক্তি যখন পরাজিত এবং মুসলিম বিশ্বে খিলাফত ও শারী'য়াহ্ আইনের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্’র গণজাগরন যখন চুড়ান্ত পর্যায়ে তখন আমেরিকার নেতৃত্বে কাফের বিশ্ব, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তৃতীয় ধাপটি গ্রহণ করেছে। আর তাহলো মুসলিম বিশ্বের দালাল শাসকগুলোকে দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী ও অন্যান্য সামরিক-বেসামরিক সুবিধাদি ব্যবহার করে ইসলামের উত্থান ঠেকানো।

George Friedman, তার ‘***The next 100 years, a forecast for the 21st century***’ বইতে বলেছেন “The US has had the ultimate aim of preventing the emergence of any major power in Eurasia. The paradox however is as follows – the goals of these interventions was never to achieve something – whatever the political rhetoric might have said – but to prevent something. The United States wanted to prevent stability in areas where another power might emerge. Its goal was not to stabilise but to destabilise, and this explains how the United States responded to the Islamic earthquake. It wanted to prevent a large, powerful Islamic state (*khilafah*) from emerging.” তাছাড়া প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছেন- “আমরা মুসলিম বিশ্বকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা তৎপরতা, তথ্য আদান-প্রদান, counter terrorism measures সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত”। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি সৌদি আরব ও কুয়েত সহ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সম্পদ ও ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরাকে মুসলিম গণহত্যা। পাকিস্তানের সম্পদ ও ঘাঁটি থেকে আফগানিস্থানের নিরীহ মুসলিমদের হত্যাযজ্ঞ এবং সর্বশেষ পাকিস্তানে মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক পাকিস্তানের মুসলিম জনগণকে হত্যা। বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকারও এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলে ইতিমধ্যেই টাইগার শার্ক নামক বাংলাদেশ-মার্কিন যৌথ নৌমহড়া সম্পন্ন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা গ্রহণ করেছে। এমনই এক বাস্তবতায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে কাশ্মির ও গুজরাটে মুসলমান গণহত্যাকারী ভারত এবং সারা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী আমেরিকার চাহিদামত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের পর বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম ভূখন্ড বাংলাদেশকে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত

করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ভারতের প্রেসিডেন্ট প্রতিভা পাতিল তাকে ক্রুসেডার উপাধী দান করেন।

সেদিন হয়তো বেশী দুরে নয় যেদিন পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকেও ইসলাম দমনে ব্যবহার করার জন্য ভারত ও আমেরিকা চাপ দিবে আর হাসিনা তখন আসিফ আলী জারদারীর ভূমিকা গ্রহণ করবে অথবা ভারত তার নিরাপত্তার অজুহাতে বাংলাদেশে সেনা পাঠাবে যার নজীর আমরা ইতোমধ্যেই ভারতীয় দূতাবাসে দেখতে পাচ্ছি।

৪.০৩ নিরাপত্তা পরিষদের জন্য ভারতকে সমর্থনঃ

ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ চায়। আর হাসিনা-মনমোহন যৌথ ঘোষণায় হাসিনা ভারতকে এ ব্যাপারে সমর্থন দিয়েছে। প্রশ্ন হলো জাতিসংঘ কি? কি এই নিরাপত্তা পরিষদ? এবং কি এদের ভূমিকা? আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা কোন প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। ১৬৪৮ সালে ইউরোপের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, ক্রুসেডের পরাজিত শক্তি, ইউরোপে ইসলামী খিলাফতের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে একত্রিত হয়ে তৈরী করছিল International Christian Community। পরবর্তীতে এর ব্যর্থতা ঢাকতে এবং আরও কার্যকরী করার লক্ষ্যে ১৮১৫ সালে Christian শব্দটি বাদ দিয়ে এর নামকরণ করে International Community। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী এ সংস্থাটি বর্জন করে। আর তাই ১৯১৯ সালে সংস্থাটিকে ভেঙ্গে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলা হয় League of Nations। এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি ১৯৪৫ সালে গড়ে তোলে United Nations বা জাতিসংঘ। আর নিরাপত্তা পরিষদ এবং এর সদস্যরা কারা? নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডার কাফের শক্তিরা। বিশ্বব্যাপী তারা তাদের দখলদারীত্ব, হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, সম্পদ লুন্ঠন ইত্যাদি করে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে বৈধতা দান করে। এই নিরাপত্তা পরিষদ মুসলিম বিশ্বে গণহত্যা, দখলদারিত্ব ও লুন্ঠনের হাতিয়ার এবং ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

ভারত গত ৬০ বছর ধরে কাশ্মিরের মুসলিমদের হত্যা, ধর্ষণের জন্য দায়ী। অধিকন্তু এই মুশরিক সেক্যুলার রাষ্ট্র ভারত গুজরাটে হাজার হাজার মুসলিম নিধনের নায়ক। আর ভারত যদি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে তবে বাংলাদেশ, কাশ্মিরসহ এই অঞ্চলের মুসলিম ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত তার অন্যায় অপকর্মের বৈধতা নিয়ে নেবে। এমনকি বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার উপর দখলের বৈধতা আদায় করে নেবে; এমন সম্ভাবনা অসম্ভব কিছু না। প্রশ্ন হলো এর মাধ্যমে ভারতের দালালী ছাড়া শেখ হাসিনা কী দূরদর্শীতার প্রমাণ দিলেন?

৫.০ একশত ভাগ সফল এমন দাবীর যথার্থতাঃ

শেখ হাসিনা একশত ভাগ সফল হয়েছেন এমন দাবী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, এর অঙ্গসংগঠন সমূহ, সরকারের এমপি-মন্ত্রী, বাংলাদেশে বসবাসরত ভারতপ্রেমী মিডিয়া এবং কিছু পরগাছা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা করেছেন। খোদ শেখ হাসিনা নিজেই তার সংবাদ সম্মলনে এমন দাবীর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। ঢাকা শহরে অসহনীয় যানজট তৈরী করে মিথ্যা জনপ্রিয়তার নাটক মঞ্চস্থ করে তিনি যে সফলতার কথা বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা জরুরী। হাসিনার সরকার পঞ্চাশ দফা সমঝোতা স্মারকে যে সফলতার কথা বলেছেন তার তিনটি দিক রয়েছে ঃ (ক) মনমোহন সিং হাসিনাকে টিপাইমুখ সম্পর্কে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোন পদক্ষেপ নিবে না ; (খ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে এক বিলিয়ন ডলার ঋণ সহযোহগীতা প্রদানের অঙ্গিকার করেছেন; এবং (গ) ভারত থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছেন।

একটু চিন্তা করলেই সরকারের এসব সফলতার দাবীর অযৌক্তিকতা বুঝা যাবে।

- চুক্তি স্বাক্ষরের পর শেখ হাসিনা ভারতে বসে যে সংবাদ সম্মলন করেন তাতে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী টিপাইমুখ সম্পর্কে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোন পদক্ষেপ নিবে না। আবার গত ১৬ই জানুয়ারীর ঢাকার সংবাদ সম্মলনে শেখ হাসিনা বলেন "টিপাইমুখ বিষয়টি আমি নিজেও বুঝি না।" তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় শেখ হাসিনা মনমোহন সিংকে বাংলাদেশের স্বার্থের জন্য কি ভালো আর কি খারাপ তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে ভারত ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে যে আশ্বাস প্রদান করেছেন যার ফল ফারাক্কা, এদেশের উত্তরাঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। উল্লেখ্য শেখ মুজিব ১৯৭২ সালে একচল্লিশ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ফারাক্কা চালু করার ব্যাপারে ভারতের সাথে সম্মত হন, কিন্তু আজও ভারতের জন্য ভারতের জন্য পরীক্ষামূলক সেই ৪১ দিন শেষ হয়নি! বর্তমানে বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের মুসলিমদের একটি মরুভুমি উপহার দেয়ার প্রক্রিয়াকে বৈধতা দান; যোগ্য পিতার সুযোগ্য কন্যার সফলতাই বটে! তাছাড়া মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে চুক্তির ছয় দিনের মাথায় বেড়ুবাড়ী ভারতকে হস্তান্তর করলেও আজ পর্যন্ত ভারত, প্রতিশ্রুত তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে ফেরত দেয়নি।

  সম্প্রতি ২০০৭ সালে সিডরের পর বাংলাদেশের শরণখোলার দশটি গ্রামে ষোল শত পরিবারকে গৃহ নির্মাণের ভারতীয় সাবেক পররাষ্ট্র ও বর্তমান অর্থমন্ত্রী প্রণব মূখার্জীর প্রতিশ্রুতি দীর্ঘ তিন বছর পরও পূরণ হয়নি। তছাড়া সিডর পরবর্তী চালের রাজনীতি এদেশের মুসলিম জনগণ এখনও ভুলেনি। টন প্রতি তিনশত ডলার মূল্যের চাল প্রথমে ৫০০ ডলার পরে ৮৪০ ডলার এবং সর্বশেষ ১০০০ ডলারে উন্নীত করার পরও আজো সেই প্রতিশ্রুত একশত মেট্রিক টন চাল পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে যে সামান্য পরিমান চাল

অনুদান হিসেবে বাংলাদেশে পাঠানো হয় তা এতটাই নষ্ট ছিল যে ঐ চাল বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিলে সেখানকার জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হতো।

অতিসম্প্রতি ২০০৯ সালের পিলখানাতে বাংলাদেশের ৬২ জন সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারের খুনের মহড়ায় মেতে উঠা ভারত চিরতরে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেবার পরিকল্পনা নেয়; তারপর আমাদের সেনাবাহিনী আজও সেই ধকল সামলে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে। এমনই এক বাস্তবতায় ভারতের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে ভারতপন্থী হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ভারতের সেনাবাহিনীর প্রধান, বিমান বাহিনীর প্রধানের সফর সহ যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে।

তাছাড়া খোদ ভারতের মাটিতেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় 'নিখিল বঙ্গ সংঙ্ঘের' ব্যানারে চলছে বাংলাদেশকে বিভক্ত করার এক জঘণ্য ষড়যন্ত্র। সম্প্রতি কলকাতার বঙ্গসেনারা এদেশের ১৯টি জেলা নিয়ে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক একটি প্রবাসী বঙ্গভূমি সরকার গঠনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাদের শ্লোগান ছিল 'বঙ্গভূমির দখল চাই'। তারা ভারত সরকারের চোখের সামনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই হীন অপঃতৎপরতা চালাচ্ছে।

এতসব কিছুর পরও ঠিক যেদিন মনমোহন সিং শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করছেন সেই দিনই বিএসএফ কর্তৃক একজন বাংলাদেশী মুসলিমকে হত্যা করা হয়। আর তাই মনমোহন সিংয়ের বক্তব্যের ব্যাপারে শেখ হাসিনা বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে"। এটা ভারতের প্রতি তার নির্লজ্জ দালালীপনার নমুনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

- যৌথ ইশতিহারে বাংলাদেশকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের ভারতীয় আশ্বাস কিভাবে বাংলাদেশের প্রাপ্তি এবং হাসিনা সরকারের সফলতা হতে পারে? ভারত বাংলাদেশকে যে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিবে তা বাংলাদেশ কখন কিনতে পারবে? আজকে নয় বরং ২০১৩ সালে। অথচ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় বেশী বিদ্যুৎ উৎপদন করার কথা। তাছাড়া এই ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসবে? এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে দু ধরণের কথা বলা হয়েছে। ***প্রথমত:*** চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প বাংলাদেশে স্থাপিত হবে ভারতীয় সহায়তায়। এজন্য ভারত থেকে বাংলাদেশ ঋণ পাবে। কাঁচামাল আসবে বাংলাদেশ থেকে। অর্থাৎ ভারত ঋণ প্রদান করে সরাসরি বিনিয়োগ সুবিধা, ঋণের সুদ, উৎপাদিত বিদ্যুৎ ভারতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এটা কিভাবে সরকারের সফলতা হতে পারে? তাছাড়া চুক্তি মতে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনতে পারবে। অর্থাৎ এটা ৫ বা ৫০ মেগাওয়াট যাই হোক না কেন তা চুক্তির "২৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত" সীমার মধ্যেই পড়ে। এটা এদেশের

মানুষের সাথে নিছক প্রতারনা, যাকে শেখ হাসিনা সফলতা বলছেন। এটা ভারতের চাহিদা বাংলাদেশের নয়। তাছাড়া ভারত দিনে বিদ্যুৎ পাবে এবং বাংলাদেশ রাতে পাবে এমন চুক্তি দিনে ভারতের কলকারখানা সচল রাখতে এবং রাতে টিভিতে ভারতীয় হিন্দি সিরিয়াল দেখে আনন্দ পেতে ও পাঁখা চালিয়ে বাংলাদেশকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য তাবেদার এই সরকারের নতুন কৌশল বৈকি আর কিছুই নয়। ***দ্বিতীয়ত:*** টিপাইমুখ বাধে ভারত যে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা সে সম্পর্কে সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র ২০০৯ সালে বলেছেন, টিপাইমুখ বাঁধ হলে বাংলাদেশের সুবিধা হবে কারণ আমরা ভারত থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারব। বিষয়টি যদি তাই হয়, তাহলে ভারত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ হলো পরোক্ষভাবে টিপাইমুখ প্রকল্পকে শেখ হাসিনার অকুন্ঠ সমর্থন দান।

- এক বিলিয়ন ঋণ সহযোগীতার আশ্বাস কোনভাবেই সরকারের সফলতা হতে পারেনা। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ হলো প্রায় ১২০০০ টাকা। তাছাড়া ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিগত বছরগুলিতে বাংলাদেশ মোট ১৮৪ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করে। যার মাঝে ১৪২ হাজার কোটি টাকার কোন হিসাব নেই; বাকী টাকার মাত্র ২৩ ভাগ জনগণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এই ঋণের প্রয়োজনীয়তা কি? সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান আই. এম. এফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে দশকের দশক ঋণ নিয়ে তাদের কথা মত আমরা Privatisation, PRSP, SAP, PPP নামের অসংখ্য প্রকল্প গ্রহণ করে আমাদের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে যেভাবে তুলে দিয়েছি ঠিক সেই ভাবে ভারত থেকে ঋণকৃত অর্থের বিনিময়ে আমরা এদেশের নিরাপত্তা, অর্থনীতি, শিল্পায়ন ধ্বংসের ভারতীয় চক্রান্তের কার্যকর সমর্থন প্রদান কোন মতেই আমাদের জন্য প্রাপ্তি বা সফলতা হতে পারে না।

আর তাই বর্তমান সরকার যেসব বিষয়কে সফলতা হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করছে তা ব্যাপক ভিত্তিক প্রতারনার প্রচারনা। বিগত বছরগুলোতে এদেশের সকল সরকার হোক বাকশালী, সামরিক, স্বৈরতান্ত্রিক, তত্ত্বাবধায়ক বা গণতান্ত্রিক-যেভাবে কাফের মুশরিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে একের পর এক দাসত্বের চুক্তি করেছে তা যদি সত্যিই আমাদের জন্য উপকারী হতো তাহলে এসব শাসকরা আজ পর্যন্ত নির্বাচনী ইশতিহারে 'ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চাই'-এমন প্রতিশ্রুতি দেয়ার প্রয়োজন হতো না। শেখ হাসিনা অবশ্য একধাপ এগিয়ে বলেছেন- দক্ষিন এশিয়ার দারিদ্র পীড়িত মানুষের জন্য তিনি নাকি এ চুক্তি করেছেন!!!

৬.০ খিলাফত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির নমূনা ঃ

আমরা প্রায়ই ইতিহাস পড়ি ১৯৭১ সাল থেকে বা একটু বেশী জানতে চাইলে ফিরে যাই বৃটিশ-ভারত পর্যন্ত। সত্যিকার অর্থে ১৫ কোটি মুসলিম দেশে ইতিহাস আলোচনা হওয়া উচিৎ ৫৭০ খ্রীস্ট্রাব্দ থেকে। যেদিন রাসূল (সাঃ) পৃথিবীতে এসেছেন বিশ্বের বুকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে

মুসলিম উম্মাহ্‌'কে সারা বিশ্বের নেতৃত্বশীল জাতিতে পরিণত করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় এসেছেন খলিফা আবুবকর (রাঃ), খলিফা ওমর (রাঃ), খলিফা উসমান (রাঃ) এবং খলিফা আলী (রাঃ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উসমানীয় খিলাফতের শেষ খলিফা আব্দুল মজিদের(র:) মত শাসক। যারা শাসন করেছে পৃথিবীর এক বিশাল ভূখন্ড। বাংলাদেশের মত বা কুয়েতের মত ছোট কোন ভূখন্ড নয়। প্রশ্ন হলো কিভাবে খলিফারা তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে হাজার বছর বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছেন? কি ছিলো তাদের পররাষ্ট্রনীতি? কি ছিলো তাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিশন?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন-

"তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে, যাতে একে সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা আছ্-ছফ : ৯]।

উপরন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন- *"হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু ...।"* [সূরা মায়েদা : ৫১];

"ইহুদী ও ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন ...।" [সূরা বাকারা : ১২০];

"আপনি মানবজাতির মধ্যে ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের অধিক শত্রু হিসেবে পাবেন...।" [সূরা মায়েদা : ৮২]

"... এবং কিছুতেই আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।" [সূরা নিসা: ১৪১]

পবিত্র কুর'আনের এসব আয়াত মুসলিম খলিফাদেরকে খিলাফত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সাজাতে সাহায্য করেছে। আজকে যখন ভারতের প্রতি আনুগত্যের জন্য ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে শেখ হাসিনা ভূষিত হন যা এর আগে ২০০৫ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন চাকর হামিদ কারজাই ও ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে মার্কিনীদের দালাল বিশ্ব সুদখোর ড.ইউনুসকে দেওয়া হয়েছিল, তা পরিস্কারভাবে খলিফাদের সাথে এসব দালাল শাসকদের পার্থক্য মুসলিম উম্মাহ্‌'র সামনে সুস্পস্ট করে দেয়।

১৫ কোটি মুসলমানের দেশে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে খলিফা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবার জন্য কুর'আন সুন্নাহ্‌'র আলোকে তার পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজাবেন। যার কিছু দিক নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- *"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে, যাতে একে সকল জীবনব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরেকরা তা অপছন্দ করে।"* [সূরা আছ্-ছফ : ৯], এ আয়াতের আলোকে খলিফা ইসলামের বাণীকে বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সম্পর্ক তৈরী ও সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।
- খিলাফত রাষ্ট্র বিশ্ব পরিমন্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন কোন রাষ্ট্র হবেনা বরং ৫৭ টি মুসলিম ভূখন্ডকে একত্রিত করে এর মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগলিক অবস্থানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে। খিলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্ব তখন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন ও রাশিয়ার সাথে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করে বিশ্বের নেতৃত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে।
- খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা সমগ্র কাফের মুশরিক বিশ্বকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করবে। একটি হলো শত্রু রাষ্ট্র যেমন আমেরিকা, ইসরাইল, বৃটেন, ভারত। আর অপরটি হলো সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্র যেমনঃ অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক ইত্যাদি।
- সম্ভাব্য শত্রু রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক, বানিজ্যিক ও মৈত্রি চুক্তি হতে পারে তবে তা অবশ্যই খিলাফতের উদ্দেশ্য ও শারীয়াহ্‌'র সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। চুক্তিটি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য হতে হবে এবং মুসলিমদের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে না।
- খলিফা মুসলমানদের অভিভাবক; আমাদের বর্তমান শাসক হাসিনা-খালেদা, জারদারী-গিলানী, মাহমুদ আব্বাস, কারজাই-মুবারক-মালিকীদের মত কাফের সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হবেন না। আর তাই কুর'আনের আয়াত "হে *মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু ...।"* [সূরা মায়েদা : ৫১] অনুসারে শত্রু রাষ্ট্রের সাথে কোন প্রকারের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তিতো করবেই না বরং অবশ্যই আল্লাহ্‌'র এবং মুসলিমদের শত্রু এসব রাষ্ট্রের সাথে বর্তমান যেসব চুক্তি আছে তা শুরুতেই বাতিল করা হবে। আর তাই মুসলিমদেরকে কাফিরদের অধিনস্থ করার চুক্তি যথা ট্রানজিট, টিফা, সোফা, হানা, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম নিধনের চুক্তি বাতিল করা হবে।
- যৌথ সামরিক মহড়ার নামে মুসলিমদের সামরিক শক্তি, গোয়েন্দা তথ্য এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ভুলণ্ঠনকারী কোন ধরনের চুক্তি করা হবে না।
- রাসূল (সাঃ) বলেছেন, **"মানুষ তিনটি বিষয়ে শরিক। পানি, বিস্তীর্ণ চারণভূমি ও আগুন।"** এই হাদিসের আলোকে মুসলিমদের খনিজ সম্পদ, বিস্তীর্ণ চারণভূমি এবং সামুদ্রিক ও নৌসম্পদ কাফের মুশরিদের হাতে বা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেবার মতো কোন চুক্তি খিলাফত গ্রহণ করবে না।
- খিলাফত রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অপরাধ, রাজনৈতিক মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র ও দালাল ব্যক্তিদের আসল চেহারা জনম্মুখে প্রকাশ করে এসবের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। অবশ্য এক্ষেত্রে এমন কোন রাজনৈতিক উপকরন ব্যবহার করা যাবেনা যা শারীয়াহ্‌'র সাথে সাংঘর্ষিক।

- সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নামে মুসলমানদের আক্বিদা ভূ-লুন্ঠিত করে গণহারে জাহান্নামে নেয়ার হীন অনৈসলামিক এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রাগান্বিত করার চুক্তি করা যাবেনা। এসব চুক্তি থাকলে তা সাথে সাথে বাতিল করা হবে।
- বিদেশী কুটনৈতিকদের এদেশে চলাচলের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে তারা কাজ করবে। শত্রু রাষ্ট্রের সকল কুটনৈতিকদের বহিঃস্কার করা হবে, ইত্যাদি।

এমনই নীতিমালার আলোকে তেরশত বছর ধরে বিশ্বকে নেতৃত্বদানকারী খিলাফত রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে কি ধরণের চুক্তি করেছিলেন তার দু-তিনটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো-

- রাসূল (সাঃ) এর সাথে মুদলিজ ও দুমরাহ গোত্রের চুক্তি। যার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) নিশ্চিত করেছিলেন যে মুসলিম সেনাবাহিনী মুদলিজ ও দুমরাহ গোত্রের সীমান্ত এলাকা দিয়ে জিহাদে যাওয়ার সময় যেন কোন ধরণের আক্রমনের শিকার না হয় বরং সেনাবাহিনীর যাত্রাপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এভাবেই তিনি করিডোর আদায় করেছিলেন কাউকে করিডোর দেননি।
- আমাদের দালাল শাসকগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ সুলতান সেলিমের আলজেরিয়া প্রদেশের গভর্ণরের কাছ থেকে। ১৭৯৫ সালে উসমানিয়া খিলাফতের এই গভর্ণর বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলজেরীয় কারাগারে বন্দী ১০০ মার্কিন নাগরিকের মুক্তি প্রার্থনা করে এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বানিজ্য জাহাজের নিরাপদ যাতায়াতের অনুমতি লাভ করে। এর বিনিময়ে খিলাফতকে ৬০০০০০ ডলার সমপরিমান স্বর্ণ মূদ্রা ও ১২০০ হাজার উসমানীয় মূদ্রা লিরা প্রদান করে। উপরন্তু এই প্রথম মার্কিনীরা তাদের নিজস্ব ভাষা বাদ দিয়ে খিলাফতের ভাষায় চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
- ১৮৬২ সালে আব্রাহাম লিংকন খিলাফতের সাথে Commerce and Navigation Treaty স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আব্রাহাম লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে মুসলিম জাহানের খলিফাকে প্রধান অতিথি করে আমন্ত্রন পত্র পাঠায়। খলিফা নিজে না গিয়ে আলজেরিয়ার গভর্ণরের একজন নিম্নশ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রেরণ করেন। উক্ত কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এমনই ছিলো কুর'আন-সুন্নাহ্‌'র আলোকে পরিচালিত খিলাফত ব্যবস্থায় মুসলমানদের গৌরবোজ্জল দিনগুলো। অথচ আজ কাফির-মুশরিকদের দেয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মুসলমানরা শাসিত হচ্ছে খালেদা-হাসিনার, কারজাই-জারদারীর মত দালাল শাসকদের দ্বারা।

৭.০ উপসংহার ঃ

আজকে বাংলাদেশসহ সারা মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিমদের কাফিরদের অধীনস্থ করে রেখেছে। আর এই কাফেরদের হাতে ভূলুন্ঠিত হচ্ছে মুসলিমদের বিশ্বাস, জীবন ও সম্পদ। পরিবর্তনের রাজনীতির মিথ্যা আশ্বাসে কোন পরিবর্তন আসেনি। বিভিন্ন মতবাদ-দলের ছদ্মাবরনে এরা সবাই ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অনুগত দালাল। এরা কখনও একটি অপরটির বিকল্প হতে পারেনা; না আওয়ামী লীগ বিএনপির কিংবা বিএনপি আওয়ামী লীগের।

মুসলিমদের জন্য একমাত্র বিকল্প, বৈধ, গ্রহণযোগ্য ও আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক মনোনিত ব্যবস্থা খিলাফত ব্যবস্থা। যা রাসূল (সাঃ) মদীনাতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খিলাফত সরকারই মুসলিমদের একমাত্র মুক্তির উপায়। এটা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব। খালেদা-হাসিনার সাথে মুসলিমদের খলিফাদের কোন তুলনাই হয়না। সারা বিশ্বের মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অচিরেই আসবে খিলাফত ইনশা'আল্লাহ্‌। রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"........অতঃপর আসবে খিলাফত নবুয়্যতের আদলে" (সহীহ মুসলিম)।

০৫ সফর, ১৪৩১ হিজরী।
২২ জানুয়ারি, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ।